بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩৬। www.motaher21.net

لِمَ تُحَرِّمُ

কেন হারাম করছ?

Why do you ban?

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ? (এর দ্বারা) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও, (আল্লাহ তোমার এ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

নামকরণ :

التحريم শব্দটি حرم ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল। অর্থ হল : হারাম করা, নিষিদ্ধকরণ বা অবৈধকরণ ইত্যাদি। এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত لِمَ تُحَرِّمُ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সূরাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক একটি হালালকৃত বস্তুকে হারাম করে নিয়েছিলেন, সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

সূরার শুরুতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রীদের মাঝে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের প্রতি হালাল জিনিস না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিরস্কার করলেন, তারপর মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা সপরিবারে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার ও একনিষ্ঠ তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরার শেষে কাফির ও মু'মিনদের জন্য চারজন নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

শানে নুযূল :

এ সূরাটির শুরুর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণের ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

(১) আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন। আসর সালাত আদায় শেষে স্ত্রীদের ঘরে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতেন। (সহীহ বুখারী হা. ৬৬৯১)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : একদা তিনি যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর কাছে মধু পান করেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। (আয়িশাহ (রাঃ) বলছেন) আমি ও হাফসাহ (রাঃ) স্থির করলাম আমাদের দুজনের যে ঘরেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসবেন, সে-ই তাঁকে বলব

: আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? (মাগাফীর এক প্রকার গাছের মিষ্টি আটা যা খেলে মুখে একপ্রকার গন্ধ সৃষ্টি হয়) তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী তা-ই করলেন। তারা বললেন : আমরা আপনার মুখে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন : না, বরং আমি যয়নব বিনতে জাহাশের ঘরে মধু পান করেছি। আমি শপথ করে বলছি : আর কখনো মধু পান করব না। তুমি এ ব্যাপারটি অন্য কাউকে জানাবে না। তখন এ সূরার প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী হা. ৪৯১২)

(২) একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসাহ (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন, তখন হাফসাহ (রাঃ) বাপের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মারিয়া কিবতী একত্রে তার ঘরে। (মারিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্রীতদাসী, তার গর্ভে ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেছিল) মারিয়া বের হওয়ার পর তিনি প্রবেশ করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হাফসার চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন : তুমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে সংবাদ জানাবে না। আমি তোমার সাথে কথা দিচ্ছি আমি কখনো তার কাছে যাব না। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (সহীহ নাসায়ী, আলবানী ৩/৮৩১ হাকেম ৩২/৪৯৩)

আবার কেউ কেউ বলেছেন : যে মহিলা নিজেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর) ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন : প্রথমত এ ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা একে অপরকে বলিষ্ঠ করে। দ্বিতীয়ত : একই সময়ে উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর)।

(৬৬-তাহরীম) : বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য:

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক: হালাল হারাম এবং জায়েজ নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ তা'আলার নবীর (সা:) কাছেও তার কোন অংশ হস্তান্তর করা হয়নি। নবী, নবী হিসেবে কোন জিনিসকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করতে পারেন কেবল তখনই যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ইঙ্গিত থাকে। সে ইঙ্গিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়ে থাক কিংবা তা অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়ে থাক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খোদ আল্লাহ কর্তৃক মোবাহকৃত কোন জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নেয়ার অনুমতি কোন নবীকেও দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই: মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোন মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোন গুরুত্বই বহন করে না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর

জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী-রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাঁদের অতি ক্ষুদ্র কোন পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থি না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোন ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোন জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোন মিল নেই।

তিন: ওপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর (সা:) পবিত্র জীবনকালে যেসব কাজকর্ম ও হুকুম-আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরোপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐ সব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদের এই বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে, আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। আর নবীর (স:) পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদারদের মা বলে ঘোষণা করেন এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্য তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া নবীকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মাতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল এবং উম্মুল মু'মিনীনদেরকে ঈমানদারদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে তাঁর কিতাবে এসব উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না, কিংবা তা থাকতেও পারে না। একথা স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোন মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা খোদা নন যে, তাঁদের কোন ভুল-ত্রুটি হতে পারে না। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোন ভুল-ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম হোন বা নবীর (সা:) পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্বার উর্ধ্বে ছিলেন না। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের

যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার ওপর তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে সাহাবা কিরাম কিংবা নবীর (সা:) পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী (সা:) নিজেও তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেও কুরআন মজিদে তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন যাতে মুসলমানগণ কখনোই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোন অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে ওহোদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবা কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন:

"আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাংখা তোমরা করছিলে আল্লাহ তা'আলা যেই মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তাঁর হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।" (আয়াত ১৫২)

অনুরূপভাবে সূরা নূরে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ সাহাবীগণকে বলেন:

"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মু'মিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ। ..... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখ, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে, যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্য এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।" (আয়াত, ১২ থেকে ১৭)

সূরা আহযাবে নবীর (সা:) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের

প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আয়াত, ২৮, ২৯)

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেল এবং (হে নবী) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (আয়াত ১১)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া নবীর (সা:) মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের মধ্যেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম এবং নবীর (সা:) পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদেরকে রাদিয়াল্লাহ আনহুম ওয়া রাদু আনহু অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এই শিক্ষা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদী ও খৃস্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদীস, তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ে এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, নবীর (সা:) পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ত্রুটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নাই। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবীদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশী মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশী জানতেন।

পঞ্চম যে কথাটি এ সূরায় খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। এ দ্বীন অনুসারে ঈমান ও আমলের বিচারে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তাই সে পাবে। অতি বড় কোন বোজর্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাও তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় এবং অত্যন্ত খারাপ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশেষ করে নবীর (সা:) পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে নূহ (আ:) ও হযরত লূতের (আ:) স্ত্রীদের। তারা যদি ঈমান আনয়ন করত এবং তাদের মহাসম্মানিত স্বামীর সাথে সহযোগিতা করত তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের যে মর্যাদা তাদের মর্যাদাও তাই হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এর বিপরীত আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছে তাই নবীদের স্ত্রী হওয়াটাও তাদের কোন কাজে আসেনি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউনের স্ত্রীর। যদিও তিনি আল্লাহর জঘন্য এক দুশমনের স্ত্রী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফেরাউনের কওমের কাজ কর্ম থেকে নিজের কাজ কর্মের পথ সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন তাই ফেরাউনের মত চরম পর্যায়ের কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর কোন ক্ষতির কারণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত মারয়াম

আলাইহিস সালামের। তাঁর এই বিরাট মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করার ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কুমারী অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জিযা হিসেবে গর্ভবতী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাঁর রব তাঁর দ্বারা কি কাজ নিতে চান তাও তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত মারয়াম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অভিজাত ও নেককার মহিলাকে এরূপ কোন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কখনো ফেলা হয়নি। হযরত মারয়াম এ ব্যাপারে যখন কোন আফসোস ও আর্তনাদ করেননি বরং একজন খাঁটি ঈমানদার নারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যা বরদাশত করা অপরিহার্য ছিল তা সবই বরদাশত করা স্বীকার করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে سيدة النساء فى الجنة 'বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী' (মুসনাদে আহমাদ) হওয়ার মত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এসব বিষয় ছাড়াও আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এ সূরা থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে, কুরআন মজীদে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেবল সেই জ্ঞানই আসতো না। বরং তাঁকে অহীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সূরার ৩নং আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনীয় একটি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা অন্য কাউকে বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। অতপর নবী (সা:) এই ত্রুটির জন্য তাঁর সেই স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর এই ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে কে অবহিত করেছেন। নবী (সা:) জবাব দিলেন। যে সত্তা আলীম ও খাবীর তিনিই আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোটা কুরআন মজীদের মধ্যে সেই আয়াতটি কোথায় যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীকে গোপনীয় যে কথা বলেছিলে তা সে অন্যের কাছে বা অমুকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে? কুরআনে যদি এমন কোন আয়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তা নেই তাহলে এটাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্য অহী আসতো। কুরআন ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আর কোন অহী আসতো না, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবি এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

১ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

স্ত্রীর সন্তুটি হাসিলের জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালাল বস্তুকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিন্দা করেছেন। পরবর্তীতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শপথের কাফফারা দিয়ে ফিরে আসলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে নিন্দার বাণী তুলে নিয়েছেন। যার প্রমাণ বহন করেছে আয়াতের শেষাংশ

(وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

'আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

এ আয়াত প্রমাণ করছে কেউ যদি হালাল জিনিস নিজের ওপর হারাম করে নেয় তাহলে তা হারাম হবে না। কারণ হালাল হারামের বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ আয়াত আরো প্রমাণ করছে যে, কোন ব্যক্তি, শাসক বা যে কেউ হোক তার ভয়ে বা সন্তুষ্টি লাভের জন্য হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করে নেয়া যাবে না।

নবী করীম (সাঃ) যে জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন তা কি ছিল? যার কারণে মহান আল্লাহ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে, যা সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা হল, তিনি যয়নাব বিনতে জাহশ্ (রাঃ)র কাছে কিছুক্ষণ থাকতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন। হাফসা এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) স্বাভাবিকতার অধিক সময় তাঁর সেখানে থাকার পথ বন্ধ করার জন্য ফন্দি আঁটলেন যে, তাঁদের কারো কাছে যখন তিনি আসবেন, তখন তাঁরা বলবেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি 'মাগাফীর' খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীর'এর গন্ধ আসছে। ('মাগাফীর' এক প্রকার গাছের মিষ্ট আঠা, যা খেলে মুখে এক প্রকার গন্ধ সৃষ্টি হয়।) সুতরাং তাঁরা পরিকল্পনা অনুযায়ী তা-ই করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, "আমি তো যয়নাবের ঘরে কেবল মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনও তা পান করব না। তবে এ কথা তোমরা অন্য কাউকে বলো না।" (বুখারীঃ সূরা তাহরীমের তফসীর) সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে যে, তা ছিল একটি ক্রীতদাসী যাকে তিনি নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। (সুনানে নাসায়ী ৩/৮৩)

পক্ষান্তরে কিছু অন্য আলেমগণ নাসাঈর এ বর্ণনাকে দুর্বল গণ্য করেছেন। এর বিশদ বর্ণনা অন্যান্য কিতাবে এইভাবে এসেছে যে, তিনি ছিলেন মারিয়া ক্বিবত্বিয়া (রাঃ)। যাঁর গর্ভে নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদা হাফসা (রাঃ) র ঘরে এসেছিলেন। তখন হাফসা (রাঃ) ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের (নবী (সাঃ) ও মারিয়া ক্বিবত্বিয়ার) উপস্থিতিতেই হাফসা (রাঃ) এসে যান। তাঁকে নবী (সাঃ)-এর সাথে নিজের ঘরে নির্জনে দেখে তিনি বড়ই নাখোশ হলেন। নবী (সাঃ)ও এ কথা অনুভব করলেন এবং তিনি হাফসা (রাঃ) কে খোশ করার জন্য কসম খেয়ে মারিয়া ক্বিবত্বিয়া (রাঃ) কে নিজের উপর হারাম করে নিলেন। আর হাফসা (রাঃ) কে তাকীদ করলেন যে, তিনি যেন এ কথা অন্য কাউকে না বলেন। ইমাম ইবনে হাজার প্রথমতঃ বলেন যে, এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা একে অপরকে বলিষ্ঠ করে। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, হতে পারে একই সময়ে উভয় ঘটনাই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়েছে। (ফাতহুল বারী, সূরা তাহরীমের তাফসীর) ইমাম শওকানীও এ কথার সমর্থন করে উভয় ঘটনাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করার অধিকার কারো নেই। এমন কি রসূল (সাঃ)-এরও ছিল না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল স্ত্রীর কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন যায়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবেঃ আপনি "মাগাফীর" পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়।)

সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, আমি তো মধু-পান করেছি। সেই বিবি বললেনঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা মনঃক্ষুণ্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সেই স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর গোচরীভূত করে দিল। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় । [বুখারী: ৪৯১২, ৫২৬৭, ৬৬৯১, মুসলিম: ১৪৭৪]

কোন কোন বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। একজন দাসীর সাথে থাকতেন বিধায় আয়েশা ও হাফসারাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলকে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন যে, রাসূল সে দাসীর কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ফলে এ আয়াত নাযিল হয়। [নাসায়ী: ৭/৭১,৭২, নং ৩৯৫৯, দ্বিয়া আল-মাকদেসী: আল-আহাদিসুল মুখতারাহ: ১৬৯৪, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৪৯]

এটা মূলত প্রশ্ন নয়, বরং অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, আপনি এ কাজ কেন করেছেন? বরং তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে, তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম করার অধিকার কারো নেই, এমন কি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও এ ইখতিয়ার নেই। নবী ﷺ ঐ জিনিসটিকে যদিও আকীদাগতভাবে হারাম মনে করেছিলেন না কিংবা শরীয়াত সম্মতভাবে হারাম বলে সাব্যস্ত করেছিলেন না, বরং নিজের জন্য তা ব্যবহার করা হারাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা যেহেতু সাধারণ একজন মানুষের মত ছিল না বরং তিনি আল্লাহর রসূলের মর্যাদায় অভিসিক্ত ছিলেন। তাই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নিজের ওপর কোন জিনিস হারাম করে নেয়াতে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর উম্মাতও ঐ জিনিসকে হারাম অথবা অন্তত মাকরূহ বলে মনে করতে আরম্ভ করবে অথবা উম্মাতের লোকেরা মনে করতে শুরু করবে যে, আল্লাহর হালালকৃত কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজে হারাম করে নেয়ার এই কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন।

এ থেকে জানা যায় যে, হারাম করে নেয়ার এই কাজটি নবী ﷺ নিজের ইচ্ছায় করেছিলেন না। বরং তাঁর স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন তিনি যেন এরূপ করেন। আর তাই তিনি শুধু তাঁদের খুশী করার জন্য একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারাম করে নেয়ার এ কাজটি সম্পর্কে তিরস্কার করার সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁর এই কারণটি কেন উল্লেখ করলেন? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যদি শুধু হালালকে হারাম করে নেয়া থেকে নবীকে ﷺ বিরত রাখা হতো তাহলে আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারাই এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো। যে কারণে তিনি এ কাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা বিশেষভাবে বর্ণনা করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হালালকে হারাম করে নেয়ার কারণে শুধু নবীকে (সাঃ)-ই তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সাথে সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকেও এ বিষয়ে

সতর্ক করে দেয়া যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ছিল তা তাঁরা উপলব্ধি করেননি এবং তাঁকে দিয়ে এমন একটি কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা একটি হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে পারতো।

নবী ﷺ নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিলেন সেটি কি ছিল কুরআন মজীদে যদিও তা বলা হয়নি কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত নাযিলের কারণ হিসেবে দু'টি ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ঘটনা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) সম্পর্কিত এবং অপর ঘটনাটি হলো নবী ﷺ মধু পান না করার শপথ করেছিলেন। হযরত মারিয়ার (রাঃ) ঘটনা হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রসূলুল্লাহ ﷺ আশপাশের বাদশাহদের কাছে যেসব পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে আলোকজান্দ্রিয়ার রোমান খৃস্টান ধর্মযাজকের (Patriarch) কাছেও একটি পত্র দিয়েছিলেন। আরবরা তাকে মুকাওকিস বলে অভিহিত করত। হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ এই মহামূল্যবান পত্রখানা নিয়ে তার কাছে পৌঁছলে তিনি ইসলাম কবুল করেননি কিন্তু তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং পত্রের উত্তরে লিখলেনঃ "আমি জানি আরো একজন নবী আসতে এখনো বাকী। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়ায় আসবেন। তা সত্ত্বেও আমি আপনার দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং কিবতীদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী দু'টি মেয়েকে পাঠাচ্ছি।" (ইবনে সা'দ) মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের নাম সিরীন এবং অপরজনের নাম মারিয়া। (খৃস্টানরা হযরত মারিয়ামকে মারিয়া MARY বলে থাকে) মিসর থেকে ফেরার পথে হযরত হাতিব তাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলে তিনি সিরীনকে হযরত হাসসান (রাঃ) ইবনে সাবেতের মালিকানায় দিয়ে দেন এবং মারিয়াকে তাঁর হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। ৮ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে নবীর ﷺ পুত্র ইবরাহীম জন্মলাভ করেন (আল ইসতিয়াব-আল ইসাবা)। এই মহিলা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর আল ইসাবা গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রাঃ) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। মারিয়ার আগমণ আমার কাছে যতটা অপছন্দনীয় হয়েছে অন্য কোন মহিলার আগমণ ততটা অপছন্দনীয় হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন অতীব সুন্দরী এবং নবী ﷺ তাঁকে খুব পছন্দ করেছিলেন। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহে তাঁর সম্পর্কে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, নবী ﷺ একদিন হযরত হাফসার ঘরে গেলে তিনি সেখানে ছিলেন না। সেই সময় হযরত মারিয়া সেখানে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে নির্জনে কাটান। হযরত হাফসা তা অপছন্দ করলেন এবং তিনি এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় নবীর ﷺ কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী ﷺ তাঁর কাছে ওয়াদা করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মারিয়ার সাথে কোন প্রকার দাম্পত্য রাখবেন না। কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে তিনি শপথও করেছিলেন। এসব হাদীস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের থেকে 'মুরসাল' হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদীস হযরত উমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের সনদের আধিক্য দেখে এর কোন না কোন ভিত্তি আছে বলে হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থেই এ কাহিনী উদ্ধৃত হয়নি। নাসায়ীতে হযরত আনাস থেকে শুধু এতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীর ﷺ একটি দাসী ছিল যার সাথে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতেন। এই ঘটনার পর হযরত হাফসা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর পিছে লাগলেন। যার কারণে

নবী ﷺ তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এ কারণে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করে নিচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং অপর কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত প্রতিদিন আসরের পর পবিত্র স্ত্রীগণের সবার কাছে যেতেন। একবার তিনি যয়নাব বিনতে জাহাশের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসলেন। কারণ, কোথাও থেকে তাঁর কাছে মধু পাঠানো হয়েছিল। আর নবী ﷺ মিষ্টি খুব ভালবাসতেন। তাই তিনি তাঁর কাছে মধুর শরবত পান করতেন।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এ কারণে খুব হিংসা হলো এবং আমি হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত সওদা (রাঃ) ও হযরত সাফিয়ার সাথে মিলিত হয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নবী ﷺ আমাদের যার কাছেই আসবেন সেই তাঁকে বলবে, আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। মাগাফির এক প্রকার ফুল যার মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ থাকে। মৌমাছি উক্ত ফুল থেকে মধু আহরণ করলে তার মধ্যেও ঐ দুর্গন্ধের কিছুটা লেশ বর্তমান থাকে। এ কথা সবাই জানতেন যে, নবী ﷺ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ আসুক তিনি তা একেবারেই অপছন্দ করতেন। তাই হযরত যয়নাবের কাছে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকে বন্ধ করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হলো এবং তা ফলবতী হলো। যখন কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে বললেন যে, তাঁর মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনো তিনি মধু পান করবেন না। একটি হাদীসে তাঁর বক্তব্যের ভাষা উদ্ধৃত হয়েছে এরূপঃ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ "আমি আর কখনো এ জিনিস পান করবো না, আমি শপথ করেছি।" অপর একটি হাদীসে শুধু فَلَنْ أَعُودَ لَهُ কথাটি আছে وَقَدْ حَلَفْتُ কথাটির উল্লেখ নেই। ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীসটি ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন তাতে বক্তব্যের ভাষা হলোঃ والله لااشربه আল্লাহর কসম, আমি আর তা পান করবো না।

বড় বড় মনীষী এই দু'টি কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় কাহিনীটিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং প্রথম কাহিনীটিকে অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেনঃ "মধুর ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারে হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ এবং হযরত মারিয়াকে (রাঃ) হারাম করে নেয়ার ঘটনা কোন উত্তম সনদে বর্ণিত হয়নি।" কাজী আয়াজ বলেনঃ "নির্ভুল কথা এই যে, এ আয়াতটি হযরত মারিয়ার (রাঃ) ব্যাপারে নয়, বরং মধু সম্পর্কিত ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।" কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীও মধু সম্পর্কিত কাহিনীকেই বিশুদ্ধ বলে মনে করেন এবং ইমাম নববী ও হাফেজ বদরুদ্দীন আইনীও এই মতটিই পোষণ করেন। ফাতহুল কাদির নামক ফিকাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনে হুমাম বলেনঃ মধু হারাম করে নেয়ার কাহিনী বুখারী ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন যাঁকে নিয়ে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেনঃ সঠিক কথা হলো, নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেয়া সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।